অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

ঋতুপর্ণ'র সিনেমায় নরনারীর সম্পর্কের গোপন জটিল খেলা

মধুসূদন কর

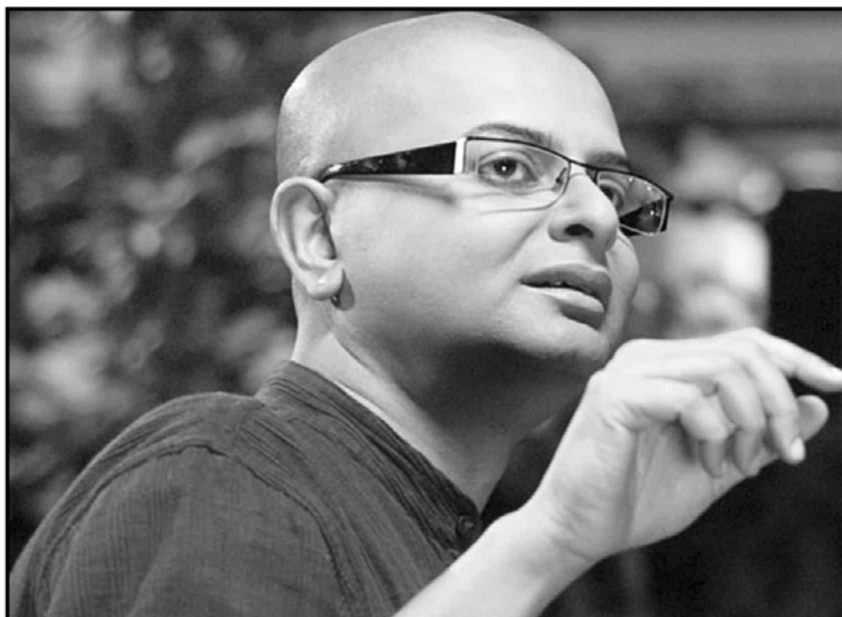

৩০ মে, ২০১৩ তারিখে চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের অকাল প্রয়াণ ঘটে। তারপর কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু ঋতুপর্ণকে ভুলে যাওয়া সিনেমাপ্রেমী বাঙালি বা ভারতবাসীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তিনি শুধুমাত্র একজন অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত চিত্র পরিচালক ছিলেন তাই নয়, তিনি সিনেমা পরিচালনায় একটি ঘরানার স্রষ্টা করেছিলেন। যে পথ ধরে পরবর্তীকালের সিনেমা নির্মাতারা এগিয়ে চলেছেন। ১৯৯২ সালে ভারত তথা বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রয়াত হয়েছেন— নিয়তির বিস্ময়কর ছলনা, ওই বছরেই মুক্তি পায় ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রথম ছবি 'হীরের আংটি'। যেন তোমার হল শুরু আমার হল সারা। হীরের আংটি মূলত ছোটদের ছবি। ম্যাজিক দেখা গেল পরের ছবিতে 'উনিশে এপ্রিল'। এখান থেকেই আপন স্বত্ত্বাকে খুঁজে পেলেন ঋতুপর্ণ। তাঁর ছবিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে মানুষের সঙ্গে মানষীর সম্পর্ক --- জটিল সর্পিল সমাজবহির্ভূত বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই সাহসিকতাকে কুর্ণিশ করেছেন তাবড় বড়ো বড়ো পরিচালকেরা।

১৯৯৪ সালে মুক্তি পায় ১৯শে এপ্রিল। সরোজিনী (অপর্ণা সেন) একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। তাঁর ডাক্তার কন্যা অদিতি (দেবশ্রী)। নিয়মিত তাঁদের বাড়িতে আসেন একজন চিত্রশিল্পী (দীপঙ্কর দে)। সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্ব ছাড়িয়ে অনেকদূর প্রলম্বিত হয়। অদিতি এটা মানতে পারে না। তার ধারণা, মায়ের অবহেলার কারনেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। ১৯শে এপ্রিলের একরাতে সে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মঘাতী হবার সিদ্ধান্ত নেয়। ছবিটি একদিকে যেমন সারা দেশের শ্রেষ্ঠ সিনেমার স্বীকৃতি পায়, অন্যদিকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে তুমুল জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৯৯-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'বাড়িওয়ালি'র মধ্যে নানা চোরা শ্রোত, হৃদয়ের বিষন্নতার কথা। বাড়িওয়ালি ওরফে বনলতা (কিরণ খের) বিয়ের রাত্রে বিধবা হন। তারপর কাজ পড়ে পিতার জনমানবশূন্য প্রাসাদোপম বাড়ির দেখভাল করা। ওই বাড়িতেই একজন চিত্রপরিচালক (চিরঞ্জিৎ) সিনেমার সুটিং করতে আসেন। চিরঞ্জিতের আবার স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। বনলতার নিঃসঙ্গ জীবনে চিত্রপরিচালক প্রেমের আবহ বয়ে আনে। অপর্ণা সেন বাড়িওয়ালিকে বাংলার সর্বকালের সেরা ছবির মর্যাদা দেন। 'অসুখ' ছবিটির মধ্যে পিতাপুত্রীর মধ্যে জটিল সম্পর্ক দর্শককে বিহ্বল করে দেয়। ছবিতে কন্যা রোহিনীর (দেবশ্রী) মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। রোহিনীর বাবা এডস্ অসুখে আক্রান্ত এমন একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়। বাপ মেয়ে একঘরে থাকে অথচ মনের দিক থেকে কত দূরে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আসল অসুখ রোহিনীর মনে। 'উৎসব' ছবির সৌজন্যে ঋতুপর্ণ দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের শিরোপা পান। ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উৎসব ছবিতে দুর্গাপুজোর উৎসবে সামিল হন একটা গোটা পরিবারের সমস্ত লোকজন। যাঁরা রাজ্য বা দেশের বাইরে থাকেন তাঁরাও এসেছেন। এখানেই জানা যায় দীপঙ্কর দে এবং মমতাশঙ্কর একে অপরের জ্ঞাতি হওয়া স্বত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে প্রেমের চোরাটান ছিল। আবার অর্পিতা পালের লিপে শ্রাবণী সেন যে গানটি গেয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন সেই 'অমলধবল পালে লেগেছে' গানটি অর্পিতা গাইতে থাকেন যার উদ্দেশ্যে সে তার 'কাজিন' খুড়তুতো ভাই, এমন সব চোরা সম্পর্কের রূপালি মুক্তি ঋতুপর্ণ ঘটিয়েছেন যা একই সঙ্গে কৌতুককর এবং গভীর মানসিক ব্যঞ্জনা তৈরি করে। তিতলি ছবিতে তিতলি একটি কিশোরী মেয়ে (কঙ্কনা সেন শর্মা)। সে একজন সিনেমাস্টার রোহিতকুমারের প্রতি এমন এক আসক্তি পোষণ করে যা অনেকটা প্রেমের কাছাকাছি যায়— আবার রোহিত কুমার ছিলেন তার মায়ের প্রাক্তন প্রেমিক। তিতলি রোহিতকুমারকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ২০০৩ সালে নির্মিত 'চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের রচনা। ঋতুপর্ণর প্রতিভার শক্তিতে চোখের বালি অপরূপ হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র (প্রসেনজিৎ) বিবাহিত হওয়া স্বত্ত্বেও বিনোদিনীর (ঐশ্বর্য রাই) সঙ্গে ঘনঘোর ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। 'দোসর', 'নৌকা ডুবি' কিংবা 'সব চরিত্র কাল্পনিক' ছবিতেও পরকীয়া প্রেমের ঘনঘটা। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে যায় ২০১৩ সালে নির্মিত আবহমান। এটা যেন তিতলির বিপরীতধর্মী অভিঘাত সৃষ্টি করে। এই ছবিতে দীপঙ্কর দে একজন চিত্র পরিচালক যার স্ত্রী মমতাশঙ্কর এবং পুত্র যীশু সেনগুপ্ত। সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী (অনন্যা চট্টোপাধ্যায়) তাঁর বাড়িতে প্রায়ই আসেন অভিনয়ের কাজে। মমতাশঙ্কর তাঁকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন অভিনয়ের ধরণ ধারণ। প্রথমদিন তাঁর কিন্তু প্রথম দেখা হয় যীশুর সঙ্গে। যীশু বিবাহিত (স্ত্রী রিয়া সেন)। যীশুর সঙ্গে তাঁর মানসিক নৈকট্য তৈরি হয়। এক সময় বোঝা যায় শুধু যীশু নয়, প্রবীন পরিচালকও নায়িকার প্রতি সমান অনুরক্ত। পিতাপুত্রের সঙ্গে একই রমণীর গোপন কিন্তু মধুর সম্পর্ক। সম্পর্কটি সমাজবহির্ভূত হলেও হয়ত বিরল নয়। সিনেমাটির মধ্যে কোথাও কোনও নগ্নতা বা অশ্লীলতা নেই। একজন শিল্পীর যেটা প্রধান গুণ ইঙ্গিত ইশারা, অমোঘ কোনও দৃশ্যকল্প এসবের মাধ্যমেই ঋতুপর্ণ যা বোঝানোর বুঝিয়েছেন। ফোন এলে পরিচালক তো স্ত্রী পুত্র সকলের সামনেই কথা বলেন। তাহলে বিশেষ কোনও ফোনে উঠে যান কেন?বাইরে গিয়ে এমনকি বাথরুমে ঢুকে ফোন করেন। স্ত্রীর প্রশ্ন জাগে মনে। ছবিটির মাধ্যমে ঋতুপর্ণ ঘোষ দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পান। ছবিটির নির্মানব্যঞ্জনা অসাধারণ। ঋতুপর্ণ যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার শেষ সিঁড়িতে পা রাখলেন 'চিত্রাঙ্গদা' সৃষ্টি করে। ২০১২ সালে মুক্তি পায় ছবিটি মৃত্যুর এক বছর আগে। নর নারীর প্রেম ভালবাসার এই যে চোরাবালির টান গোপন অথচ সত্য সর্পিল সম্পর্কের প্ররোচনা, তীব্র আকুতি যা সমাজ-সংসার, যশ, প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করে দেয়, তার সর্বোচ্চ শিলালিপি 'চিত্রাঙ্গদা'। এখানে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋতুপর্ণ স্বয়ং যার চরিত্রের নাম রুদ্র। তিনি একজন পুরুষ হয়েও মেয়েদের মতো পোষাক পরেন, মেয়েদের স্বরে কথা বলেন,কানে দুল। পুরুষের লিঙ্গচেতনা তিনি জেনেছেন, এবার নারীকে বুঝে নিতে চান একই দেহে একই আত্মার ভেতরে। প্রয়োজনে জীবন বাজি রেখে। এমন ছবি বাংলায় কেন ভারতবর্ষেও হয়নি। ১৯শে এপ্রিল থেকে শুরু করে চিত্রাঙ্গদায় শেষ। ঋতুপর্ণ অকালে প্রয়াত হয়েছেন— তবুও মনে হয় ফিল্মে তাঁর অভিযাত্রা অপূর্ণ থাকেনি। নরনারীর সম্পর্কের গোপন উল্লাস প্রদর্শনে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি। একজন প্রতিভাধর শিল্পী সফল উত্তরাধিকার রেখে যান। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল। সত্যজিতের পথরেখায় দেখা মিলেছিল তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীদের। তেমনি সমকালের যাঁরা সিনেমা করছেন--- সৃজিৎ মুখার্জী, কৌশিক গাঙ্গুলী, মৈনাক ভৌমিক, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় সকলেই অকাতরে তাঁদের সিনেমাজীবনে ঋতুপর্ণ ঘোষের ঋণ স্বীকার করেন। ঋতুপর্ণ তাঁদের শিক্ষক, বন্ধু, পথপ্রদর্শক। একজন সাহসী, প্রতিভাবান সিনেমাশিল্পী হিসাবে ঋতুপর্ণ বহুদিন আমাদের স্মৃতিতে তাঁর পোশাকের মতোই ঝলমল করবেন।

দেবাংশু চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা

জলধ্বনি

এক অদ্ভুত জলধ্বনি মিশে যাচ্ছে মাটিতে
একতারা হাতে নিয়ে যে বাউল
স্ব-ইচ্ছায় হারিয়েছে পথ
তার সাথে খেলতে খেলতে
চলেছে পরিচিত নিচু ঘাস
ঘাসের শব্দ আর ছন্দ-নূপুর
সদ্য ভোরে হাটখোলা পৃথিবীর মতো
শুদ্ধ জন্মবীজ মিশে যাচ্ছে মাটিতে

এখনই তো সময় অন্তহীন নিরুচ্চারের
শিখর বেয়ে পাহাড়ের শরীর বেয়ে
ঘন আদর বেয়ে যে জলধ্বনি মিশে যাচ্ছে মাটিতে
একতারা হাতে পাগল বাউলটি আজ
পরম যত্নে যেন তাকেই সেধেছে অনন্ত অহংকারে

আত্মসমর্পণ

নিয়মিত দেখা হয় না সবার সাথে
নিয়মিত ক'জনেই বা আসে পাশাপাশি
তবু যার সাথে নিয়মিত দেখা হওয়ার কথা ছিল
সে কবেই ঝ'রে গেছে দেবদারু পাতার মতো

ভেবেছিলাম উলুঘাস পাশে রেখে
পরিচিত কুয়োর জলে ডুব দেব মাঘীপূর্ণিমায়
সারারাত হেমন্তের মাঠে উবু হয়ে বসে
ধানের বুকের দুধে হাত ছুঁইয়েছি শুধু
পারিনি মৃত্যুসুখে রক্ত মাংস মেদ স্নায়ু ঢেলে দিতে

ক'জনই বা পারে বলো মুক্ত নক্ষত্রের মতো মিলিয়ে যেতে
ক'জনই বা নিজেকে পোড়াবে বলে
হাজার জন্মের পারে এসে দাঁড়ায়।

নির্ভাবনা

দূরত্ব নিয়ে ভাবি না আজকাল
সব শেষ হ'লে ব্রহ্মের নির্জনতায়
যে উদাসীন অপাপবিদ্ধ আনন্দ উঁকি দেয়
তাকে নিয়েও ভাবি না আর

বৃহন্নলা-সময়ে আমার ঈশ্বর উন্মত্ত জ্যোৎস্নার মতো
চেয়ে থাকেন আমার দিকে
নিজের উঠোনটুকু নিজের প্রলম্বিত ছায়াটুকু
বৃত্ত এঁকে ঢেকে রাখি সংশয়ে

দূরের তারারা সন্ন্যাসীর মতো খ'সে পড়লে
ব্যালকনিতে দুঃখ নেমে আসে স্তব্ধতায়

দূরত্ব নিয়ে ভাবি না আজকাল
দেখেছি, দূরত্বটুকু ঝ'রে পড়লে
প্রতিটি পুরুষ নিপাট কৃষ্ণ হয়ে ওঠে
প্রতিটি নারী ভীষণ প্রেমিকা
আর সেই চূড়ান্ত অসহায়তায়
বিষণ্ণ স্থাপত্যের মতো জেগে ওঠে
বিপন্ন শরীর
স্তিমিত ভ্রূণ
সহজিয়া প্রেম

তাপস কুমার হাজরার তিনটি কবিতা

বইগুলো

বইগুলো সব হঠাৎ করে যদি
পাখির তো মেলত ডানা
উড়তে-পারা শিখে
তখন কি আর পড়ার কথা
রাখতে হত লিখে!

ভাবতে হত ভাবনা অতশত
বিচ্ছিরি এক মেঘলা রঙের
মনের ভিতর বসে,
সাগর কেন ঢেউ তুলে যায়
হাওয়ায় হিসেব কষে।

অঙ্ক! সে তো সঙ্গী হত খেলার
সকাল বিকেল সন্ধেবেলার
অর্থ বুঝতে পেরে,
মেঘের কোণে হাসত আলো
বৃষ্টি-বাদল ছেড়ে।

বদলে যাওয়ার ইতিহাসটা বেড়ে
দুঃখ দিতে পারত না আর
মন খারাপের ভুলে,
জ্ঞান বিজ্ঞান ভূগোল দিত
নৌকাতে পাল তুলে।

আজবকাণ্ড দেখে তুমি বলতে
বলিহারি, কিন্তু মাগো
বই যে ভীষণ ভারি
এত বই এর বোঝা পিঠে
বইতে কী আর পারি?

পাঠ

স্লেট পেনসিল ধরেই নিলাম হাতে!

অ-এ অজগর, আ-এ আসা ঝড়
এক্কাগাড়ির চাকায়,
আঁকল রাজা, আঁকল রানি
বলল, হবেই হবে।

আজ না হোক
কাল না হোক
একদিন ঠিক হবে।

জাগল আশা-আকাশ তারা
হাসল শিশির
ঘাসে—

কিন্তু গাঁয়ের মাঠে
সত্যি যা— তা দূরের দৃষ্টি
বসল না মন পাঠে!

অনুভব

এই এল তো- এই গেল সব
সারা আকাশ জুড়ে
মেঘ-বৃষ্টি টাপুর টুপুর
দৃষ্টি অচিনপুরে।

ভাসল জলা-জংলা জমি
ছোট্টবেলার স্মৃতি
সাতপুরুষের জন্মভিটের
অক্ষত আকৃতি।

গল্প-গোলাপ সাজত যেথায়
খেলার রঙিন রাজা
ভুল করলেই ফড়িং প্রজার
হত কঠিন সাজা।

ভোরের আকাশ ভাসত আলোয়
হাসত সুয্যিমামা
বটের ঝুরি ষষ্ঠি বুড়ির
পুকুর ঘাটে নামা।

দেরি হলেই ডাকত বাবা
আয় না মাগো বাড়ি
আমি বলতাম, আর দু-মিনিট-
কীসের তাড়াতাড়ি?

ভয়টা ছিল ছেলেধরার
মিথ্যে অনুভব
বোমা, বারুদ, আতঙ্ক-ভয়
ছিল না এই সব।